

Vol. 53 | No. 2 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুক্তিযুদ্ধের গান মুক্তিযুদ্ধের গান

Volume	53
Issue	2
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শাহনাজ নাসরীন ইলা
Published online	February 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i2.4
Pages	৩৯-৫৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুক্তিযুদ্ধের গান

ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা*

সার-সংক্ষেপ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজনৈতিক সংগঠনের যেমন অবদান ছিল ঠিক তেমনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মপ্রক্রিয়ারও ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গীত-গান এদেশের ব্যাপক মানুষকে করেছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত। শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানায় কিংবা পথে-প্রান্তরে গীত-গানসমূহ পালন করেছে দূরসঞ্চারী ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের গান কীভাবে বাঙালি জাতিসত্তাকে শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তা অন্বেষণের প্রয়াস থেকে লিখিত হয়েছে এ-প্রবন্ধ।

বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম সংঘটিত হয় প্রধান কয়েকটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষায়; বিশেষ করে ভারতবর্ষে দীর্ঘকালের ধর্মীয় দাঙ্গার অভিজ্ঞতা, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, জাতীয়তাবোধের ভঙ্গুর দর্শন, দমন-পীড়ন ও প্রহসন, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারসহ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার উদ্দেশ্যে। তবে ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা ও বাঙালির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সাধনায় স্বাধীনতার ভাবনা জেগেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগে। তখন থেকে স্বাদেশিকতার প্রতি প্রেম, দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটে। তবে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পরাধীনতা থেকে মুক্তি ও আত্মনির্ভরশীল জাতি প্রতিষ্ঠার উপলব্ধি থেকে নবজাগরণের সূচনা ঘটে। এই ভাবনার জাগরণ থেকেই পঞ্চকবির শিল্পভাবনার বিস্তার লক্ষ করা যায়। মুক্তিযুদ্ধ সেই অর্থে সেই মুক্তভাবনারই চূড়ান্ত বিজয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার মানসে মুক্তিযুদ্ধ বা সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ইতঃপূর্বে ১৯৫২-র রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২-র শিক্ষা আন্দোলন এবং ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার উজ্জীবনের বীজ রোপিত হতে থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে সারা পাকিস্তানব্যাপী যে গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল, সেখানে প্রতিটি

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঞ্চলের ভাষাভাষী জাতি আইয়ুব খানের ক্ষমতার অবসানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আইয়ুব খানের ১০ বছরের স্বৈরাচারনীতি পূর্ববাংলায় শোষণ-নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। মানুষের স্বাধীনতা ভোগের সকল দুয়ার ক্ষমতা ও লোভের চাদরে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল। ফলে রাজনৈতিকভাবেই গণতন্ত্র এমনকি অর্থনীতির বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল। মুক্তিযুদ্ধ তাই শুধুমাত্র একটি দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয় বরং এটি একটি জাতীয়তাবাদের দার্শনিক উপলব্ধি। আহমদ শরীফ এই বিষয়কে বলেছেন– 'বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদে' (শরীফ, ১৯৮৫ : ২২)। ফলে মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিষয় ছিল না। তা একাধারে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংগ্রাম হিসেবেও বিবেচিত। এই মুক্তিসংগ্রামে তাই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সকল শ্রেণির মানুষের সহযোগিতা পেতে দেখা গেছে। অস্ত্র হিসেবে শুধু বন্দুক-কামান-ই এই যুদ্ধে বিবেচিত হয়নি- কণ্ঠ, কলম, নৃত্যভঙ্গি, বাদ্য সবই অস্ত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাস্তার শ্লোগান গানের ভিতর যুক্ত হয়ে রঞ্জিত হয়েছে–

জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে হবে নিশ্চয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগীত যে নানা পরিসরে ভূমিকা রেখেছিল তা প্রধান ৬টি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় :

১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা

২. যুদ্ধকালীন প্রণোদনামূলক গানের ভূমিকা

৩. বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক অনুষ্ঠানমালা

৪. শরণার্থী শিবিরে উদ্বুদ্ধকরণের গান

৫. মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান

৬. স্বাধীনতা-উত্তর বিজয়ের গৌরব বন্দনামূলক গান।

১. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এই বেতার কেন্দ্র যেমন এ দেশের আপামর জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছে তেমনি মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার অন্যতম উৎসমূল হিসেবে বিবেচিত

হয়েছে। ফলে সঙ্গত কারণেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের 'দ্বিতীয় ফ্রন্ট' এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শব্দ-সৈনিক হিসেবে জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

একাত্তরের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ইয়াহিয়ার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ইতিহাসের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সাড়ে সাত কোটি বাঙালি দিশেহারা হয়ে ওঠে, সর্বত্র নেমে আসে শোকের কালোছায়া। এরকম হতাশার মধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কলাকুশলীর প্রচেষ্টায় ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতারের কালুর ঘাট প্রচার ভবনে সদ্য সংগঠিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে ১০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের দশজন সংগঠক ছিলেন সর্বজনাব বেলাল মোহাম্মদ (উক্ত বেতারের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল), সৈয়দ আবদুস শাকের (চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন বেতার প্রকৌশলী), আবদুল্লাহ আল ফারুক (বেতারের তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক), মোস্তফা আনোয়ার (বেতারের তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক), রাশেদুল হোসেন (বেতারের তৎকালীন টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট), আমিনুর রহমান (বেতারের তৎকালীন টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট), শারফুজ্জামান (বেতারের তৎকালীন টেকনিক্যাল অপারেটর), রেজাউল করিম চৌধুরী (প্রকৌশলী সহযোগী), আবুল কাসেম সন্দীপ (উপ-অধ্যক্ষ, ফটিকছড়ি কলেজ, চট্টগ্রাম) এবং কাজী হাবিবুদ্দিন আহমেদ মনি (চট্টগ্রাম প্রতিনিধি, সাপ্তাহিকী) (চৌধুরী, ২০১০ : ২৮)।

পরবর্তীকালে ২৫ মে ১১ জ্যৈষ্ঠ কলকাতা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নবরূপে চালু হয়। দ্রুত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটি পূর্ণাঙ্গ বেতারে রূপান্তরিত হলো। ঢাকা বেতারের কর্মী আশফাকুর রহমান, তাহের সুলতান ও টিএইচ শিকদার ঢাকা রেডিও স্টেশনের টেপ লাইব্রেরি থেকে অসহযোগ আন্দোলনের (১-২৫শে মার্চ) সময়কার বেশ কিছু গানের টেপ এনেছিলেন। আলোচ্য টেপগুলোর বেশ কটি গান স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত এবং এগুলো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বেকার। এছাড়াও কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ঘোষক শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল বেতারকর্মী আরো কিছু গানের টেপসহ স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে হাজির হন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক সমর দাস এবং অজিত রায় সীমিত সংখ্যক বাদ্যযন্ত্র ও শিল্পী নিয়ে শুধুমাত্র আন্তরিক নিষ্ঠার জোরে সংগীত অনুষ্ঠানগুলোকে সফল করা জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে স্টুডিও থেকে এগুলো রেকর্ড করা হয়েছে সিটি সাউন্ড প্রুফ স্টুডিও ছিলো না।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগীত শিল্পীদের অবিস্মরণীয় অবদান মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেছে। সমগ্র বাঙালি জাতিকে যুগিয়েছে অসীম সাহস ও উদ্দীপনা। সীমিত

সুযোগ-সুবিধার মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতারের শিল্পী-গীতিকার-সুরকাররা অসাধ্য সাধন করেছেন। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উদ্দীপনামূলক গান যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছে এবং উদ্বিগ্ন দেশবাসীর মনোবল বৃদ্ধি করেছে। একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেছেন– সমর দাস, সন্‌জিদা খাতুন, আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মান্না হক, রফিকুল আলম, হরলাল রায়, মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালী, এস এম আব্দুল গণি, সরদার আলাউদ্দিন, মোশাদ আলী, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, এম এ মান্নান, অরূপ রতন চৌধুরী, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, কল্যাণী ঘোষ, মনজুর আহমদ, প্রবাল চৌধুরী, মালা খান, মনোরঞ্জন ঘোষাল, মফিজ আঙ্গুর, খাজা সুজন, সুজেয় শ্যাম, তিমির নন্দী, মঞ্জুলা দাশগুপ্ত, শিলা ভদ্র, কাদেরী কিবরিয়া, ফকির আলমগীর, বুলবুল মহলানবিশ, শাহীন সামাদ, মলয় কুমার গাঙ্গুলী, রূপা ফরহাদ, উমা খান, বিপুল ভট্টাচার্য, নমিতা ঘোষ, মিতালী মুখার্জী, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, তপন ভট্টাচার্য, মলয় ঘোষ দস্তিদার, স্বপ্না রায়, তপন মাহমুদ, তোরাপ আলী শাহ, মাহমুদুর রহমান বেণু, ডালিয়া নওশীন, ঝর্ণা ব্যানার্জী, ফ্লোরা আহমেদ, শুক্লা ভদ্র, বুলা মাহমুদ, লাকী আকন্দ, রমা ভৌমিক, নিতাই চন্দ্র সরকার, গীতশ্রী সেন, শাহ আলী সরকার, সরদার আলাউদ্দিন প্রমুখ।

গীতিকারদের মধ্যে ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর, আবদুল লতিফ, হরলাল রায়, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, নঈম গওহর, শহিদুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হুদা, মোস্তাফিজুর রহমান, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরী, শেখ লুৎফর রহমান, আলতাফ মাহমুদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আবদুল গনি বোখারী, নাজিম মাহমুদ, ফেরদৌস হোসেন ভুঁইয়া, আবুবকর সিদ্দিক, দিলওয়ার, ফজল এ খোদা, মতলুব আলী, আখতার হোসেন, মোকসেদ আলী সাঁই, আপেল মাহমুদ, আবুল কাশেম সন্দীপ, আলী মোহসীন রেজা প্রমুখ। একশ জনের মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থা ছয়মাসে ভারতের বিভিন্ন শহর ও শরণার্থী শিবিরে আড়াই শত অনুষ্ঠান করে। এ-সব অনুষ্ঠানের সংগঠক-পরিচালক ছিলেন ওয়াহিদুল হক, হাসান ইমাম, সন্‌জিদা খাতুন, মুস্তফা মনোয়ার, মাহমুদুর রহমান বেণু প্রমুখ।

যন্ত্র সংগীতে ছিলেন সুজেয় শ্যাম, কালচাঁদ ঘোষ, গোপী বল্লভ বিশ্বাস, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, সুবল দত্ত, বাবুল দত্ত, অবিনাশ শীল, সুনীল গোস্বামী, তড়িৎ হোসেন খান, দিলীপ দাশ গুপ্ত, দিলীপ ঘোষ, জুলু খান, রুমু খান, জাহিদ হোসেন প্রধান, বাসুদেব দাশ, সমীর চন্দ্র, শতদল সেন প্রমুখ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং এর আগে ও পরে অনেকে এ বিষয়ে গান রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন জসীমউদ্দীন, মোমতাজ আলী খান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মোঃ মোশাদ আলী, লোকমান হোসেন ফকির, রাহাত খান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যেসব গান দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার বাসনায় উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধার মনোবল বৃদ্ধি করেছিল এবং সমগ্র বাঙালি জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান উল্লেখ করা হলো। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গানসহ বহু নতুন পুরাতন সংগ্রামের গান বেজেছে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে। এ ছাড়াও প্রচারিত হয়েছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'কেঁদো না কেঁদো না মাগো', 'নোঙ্গর তোল তোল, সময় যে হলো হলো', 'মুক্তির একই পথ সংগ্রাম', 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও', 'জগৎবাসী বাংলাদেশকে যাও দেখিয়া', 'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের', 'চল চল চল', 'জনতার সংগ্রাম চলবেই', 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে', 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে', 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে', 'দুনিয়ার যত গরীবকে জাগিয়ে দাও', 'মুজিব বাইয়া যাওরে', 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা' ইত্যাদি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বেশিরভাগ গানের সুর করেছিলেন সমর দাস, অজিত রায়, সুখেন্দু চক্রবর্তী, সুজেয় শ্যাম, সাধন সরকার, আনোয়ার পারভেজ প্রমুখ। সমর দাসের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় লং প্লে 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে'।

জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ভূপেন হাজারিকা 'জয় জয় নবজাত বাংলাদেশ জয় জয় মুক্তিবাহী' শ্যামল মিত্র 'আমরা সবাই বাঙালি' অংশুমান রায় 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' এবং বাপ্পী লাহিড়ী ' সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এই জনপ্রিয় গানগুলোতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য রচিত সুরারোপিত ও পরিবেশিত গানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	গানের শিরোনাম	গীতিকার	সুরকার	কণ্ঠশিল্পী
১	সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের	মোকসেদ আলী সাঁই	মোকসেদ আলী সাঁই	সমবেত
২	মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
৩	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	সমবেত
৪	নোঙ্গর তোল তোল সময় যে হলো হলো	নঈম গওহর	আপেল মাহমুদ	সমবেত
৫	অনেক রক্তে কিনেছি আমরা	টি এইচ শিকদার	আবদুল জব্বার	আবদুল জব্বার
৬	মুজিব বাইয়া যাওরে	সরকার আলাউদ্দিন	লোকগীতির প্রচলিত সুর	আবদুল জব্বার

৭	তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	সমবেত
৮	মুক্তির একই পথ সংগ্রাম সংগ্রাম	শহীদুল ইসলাম,	সুজেয় শ্যাম	
৯	জ্বলছে জ্বলছে জ্বলছে	শহিদুল ইসলাম	শহিদুল ইসলাম	নাসরিন, স্বরূপ
১০	শেখ মুজিবর সত্য	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ
১১	আমরা সবাই মুক্তিবাহিনী	আবদুল হালিম বয়াতী	আবদুল হালিম বয়াতী	আবদুল হালিম বয়াতী
১২	গেরিলা আমরা আমরা গেরিলা	গণেশ ভৌমিক	গণেশ ভৌমিক	সমবেত
১৩	পথে যেতে যেতে জন্ম	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
১৪	আমার মুক্তিবাহিনীর ভাইয়েরা	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ
১৫	দস্যু মারিতে চলরে ধাইয়া	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার
১৬	লেফট রাইট লেফট	গোবিন্দ হালদার		সমবেত
১৭	পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	সমর দাস ও সমবেত
১৮	জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো	নঈম গওহর	আজাদ রহমান	
১৯	বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ	গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস	সমবেত
২০	চাষাদের মুটেদের মজুরের	আলী মহসিন রেজা	রথীন্দ্রনাথ রায়	রথীন্দ্রনাথ রায়
২১	ও বগিলারে কেন বা	হরলাল রায়	রথিন্দ্রনাথ রায়	রথিন্দ্রনাথ রায়
২২	ও রে ও বাঙ্গালিরে	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার	শাহ আলী সরকার
২৩	বলো বীর সৈনিক হে	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
২৪	জনগণ চায় না যারে	আবদুল হালিম বয়াতী	আবদুল হালিম বয়াতী	আবদুল হালিম বয়াতী
২৫	শোনো একটি মুজিবরের থেকে	গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়

২৬	জয় বাংলা বাংলার জয়	মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	সমবেত
২৭	যুদ্ধ করো অসি ধরে	বাউল অনিল চন্দ্র দে	বাউল অনিল চন্দ্র দে	বাউল অনিল চন্দ্র দে
২৮	এক পৃথিবী চাই আমরা নতুন পৃথিবী	শহীদুল ইসলাম	শহীদুল ইসলাম	
২৯	সাত কোটি আজ প্রহরী প্রদীপ	সারোয়ার জাহান	সারোয়ার জাহান	
৩০	মাতব্বরি বেশি করা ভালো নয়	চারণকবি মোসলেম	চারণকবি মোসলেম	চারণকবি মোসলেম
৩১	মুক্তি ভাই ঝম ঝম করে	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ	তোরাপ আলী শাহ
৩২	হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার হুশিয়ার!	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
৩৩	তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব	হরলাল রায়		
৩৪	বাংলা থেকে দুশমনের	সরদার আলাউদ্দিন	সরদার আলাউদ্দিন	
৩৫	সোনার বাংলা করবো	মোশাদ আলী		
৩৬	আহা ধন্য আমার জন্মভূমি	রশীদ চৌধুরী	সুজেয় শ্যাম	
৩৭	দুর্জয় মোরা সাত কোটি	প্রণোদিত কুমার বড়ুয়া		
৩৮	আমার নেতা শেখ মুজিব	হাফিযুর রহমান	হাফিযুর রহমান	
৩৯	জনপথ প্রান্তরে সাগরের বন্দরে	মুস্তাফিজুর রহমান	আবদুল আজীজ বাচ্চু	
৪০	অবাক পৃথিবী দেখো	নূর আলম সিদ্দিকী	কামরুল হাসান	কামরুল হাসান
৪১	বীর বাঙালী অস্ত্র ধর	মনোরঞ্জন সরকার		
৪২	ও বাঙালি ভাই কে কে যাবি আয়রে	ইন্দ্রমোহন রাজবংশী		
৪৩	কার বা বিচার কে বা করে রে	হরলাল রায়		
৪৪	বিজয় নিশান উড়ছে ঐ	শহীদুল ইসলাম	সুজেয় শ্যাম	সমবেত
৪৫	সাগর পাড়িতে ঝড় যদি জাগেই			সমবেত
৪৬	জয়ধ্বনি কর মুজিবর	মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি	মোহাম্মদ শাহ বাঙ্গালি	

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। এই বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকগণ সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালির মনোবলকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দিবারাত্র কাজ করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার প্রচার মুক্তিযুদ্ধের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সর্বাত্মকভাবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইউনিটগুলো এবং শত্রু কবলিত এলাকার সাথে যোগসূত্র বজায় রেখেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রথম প্রচারিত হওয়ার এক ঘণ্টা কালের মধ্যে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংবাদ বিশ্বের জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল (চৌধুরী, ২০১০ : ৩৮)। এই বেতার কেন্দ্র দীর্ঘ নয় মাস ধরে অমিত তেজোময় ভাষা আর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সংগীত প্রচারের মাধ্যমে বাংলার আপামর জনগণ ও এর অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়ে, শক্তি দিয়ে, সাহস দিয়ে, দিশেহারা মুক্তিকামী বাঙালিকে বিজয়ের সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলোর পাশে সংযোজন করেছে আর একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ। পৃথিবীর স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আর কোনো বেতার কেন্দ্র এতবড় অবদান রাখতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই।

২. যুদ্ধকালীন প্রণোদনামূলক গানের ভূমিকা

দ্বিজাতিতত্ত্বের মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির কারণে ১৯৪৭-উত্তরকালে বাঙালির জনজীবনে নেমে আসে স্থবিরতা। কেবল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা নয়, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও নেমে আসে বন্ধ্যাদশা। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এ বন্ধ্যাদশার মধ্যেও সঞ্চার করে প্রাণের বীজ। তারা সঠিক মুক্তি-আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সে কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামের কথা বলেন, তখন তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়বিধ মুক্তির বারতা। রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করলেই বাঙালির মুক্তি আসবে না, যদি না জাতিসত্তার নিজস্বতা প্রকাশ না পায়। এ কারণেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে যুদ্ধের সমান্তরালে সাংস্কৃতিক আন্দোলন অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ সময় যেসব গান গীত হয়েছে সেগুলোতে ছিল শক্তি ও সত্যের প্রকাশ। সৈনিক ও শিল্পী এক প্রেরণায় গেয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী গান – 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা এবং আনোয়ার পারভেজের সুরে গীত গানটিতেও আছে প্রতিরোধের কথা, ভয়-সংশয়ে চরম বিপর্যস্ত মানুষকে আশার বাণীতে উদ্বুদ্ধ করার কথা—

জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে নিশ্চয়

কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধরাতে
নতুন সূর্য ওঠার এইতো সময়।

মুক্তিযুদ্ধে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নানামাত্রিক ভাবনা প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে হতাশা, প্রতীক্ষা, মৃত্যু ও পাশবিকতার নিষ্ঠুর পরিবেশে সংকটাপন্ন ছিল তাদের প্রতিটি মুহূর্ত। সেই সঙ্গে সুবিধাবাদী দালাল শ্রেণির গোপন চক্রান্তের সমান্তরালে প্রতিটি মানুষ প্রতিরোধের ভাষা তৈরি করেছিল যে যার মতো। মুক্তিযুদ্ধের কালের প্রত্যেক গানে এই ধরনের ভাবনার রূপরেখা পাওয়া যায়। যেমন প্রতি বছর ঈদ আসে, চাঁদ ওঠে– কিন্তু যুদ্ধকালে ঈদের চাঁদ বাংলার মানুষের কাছে কেমন ঠেকেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন শহীদুল ইসলাম, সুর করেছেন অজিত রায়–

চাঁদ তুমি ফিরে যাও
দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা
রূপালী আঁচল কোথায় রাখবে বলো।...

মোকসেদ আলী সাঁই রচিত ও সুরারোপিত–

সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে?
এহিয়া তোমায় আসামীর মতো জবাব দিতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করতে কলকাতার গীতিকার গোবিন্দ হালদারের লেখা, আপেল মাহমুদের সুরে ও কণ্ঠে কালজয়ী গান–

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি
মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র ধরি

মুক্তিযুদ্ধে অগ্নিঝরা গান যুদ্ধরত গেরিলা যোদ্ধাদের এবং স্বদেশে অবরুদ্ধ জনগণের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত করে রেখেছিল। সে গান ধমনীর রক্তে আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়ে দেহ-মনকে দেশমাতৃকার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। গোবিন্দ হালদার রচিত এবং সমর দাসের সুরে অবিস্মরণীয় গান–

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল
জোয়ার এসেছে জনসমুদ্রে
রক্তলাল, রক্তলাল, রক্তলাল

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো গ্রাম-বাংলার চারণকবিদের রচিত উদ্দীপনা ও প্রণোদনামূলক গান। প্রতিটি অঞ্চলের কবিয়াল, জারিয়াল, বাউল শিল্পীরা আপন দর্শন ও ভাবনায় রচনা করেছেন মুক্তির গান। তাঁদের গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে

ইতিহাসের পালাবদল, নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা, তাৎক্ষণিক ঘটনার বিবরণ, বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের কালে যাঁরা প্রণোদনামূলক গান রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাহ আব্দুল করিম, শফি বাঙালি, আব্দুল হালিম বয়াতি, সাইদুর রহমান বয়াতি, রাজ্জাক দেওয়ান (মাতাল রাজ্জাক) মোসলেম উদ্দিন প্রমুখ। এই লোকশিল্পীদের গায়নশৈলী ও দলীয় পরিবেশনা সারাবাংলার গ্রামীণ জীবনকে উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে রাখতো। ফেনী অঞ্চলের শফি বাঙালি গ্রাম-গঞ্জ-সভাসমাবেশে গেয়ে বেড়িয়েছেন বেশ কিছু গান তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য–

আমরা ছাড়বো না ছাড়বো না
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না
বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছে চলো মুক্তিযুদ্ধে
গোলাম হয়ে বাঁচার চাইতে মৃত্যু বহু ঊর্ধ্বে
বসে থাকবো না থাকবো না
মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়বো না।

মুক্তিযুদ্ধের গানে যুদ্ধ-সাহস-বীরত্ব-শ্লোগান এসবই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। যুদ্ধের মহাসমুদ্র যতই উত্তাল হোক না কেন যোদ্ধারা সেই উত্তুঙ্গ সাগর পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতার বিজয় নিয়েই ফিরবে। যুদ্ধে তারা নবীন,কিন্তু সংকল্প তাদের পাহাড় সমান। আরো একটি উদ্দীপনামূলক গান আপেল মাহমুদের কথা, সুর ও কণ্ঠে–

তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবো রে
আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি শক্ত করে রে

দেশের মুক্তি আর দূরে নয়। বিজয়ের সূর্য উদয়ের পথে। মুক্তির আলোর দুয়ার খুলে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রসর হওয়ার জন্য নঈম গহর রচিত সমর দাসের সুরে অনুপ্রেরণার শক্তি এই গান–

নোঙ্গর তোল তোল সময় যে হলো হলো
নোঙ্গর তোল তোল।

মুজিব এর নেতৃত্বে শিকল ভাঙার কথা এসেছে কিছু গানে। গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের কথা ও অংশুমান রায়ের সুর ও কণ্ঠে মুজিববন্দনা–

শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের
কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে উঠে রণি
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ!

'মুজিবর' ও 'জয় বাংলা' শব্দ দুটি সে সময় জাগরণের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল; সামগ্রিক মূল্যবোধের প্রতিভূ রূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। শ্যামল গুপ্তের লেখা এই গানটি–

সাড়ে সাত কোটি মানুষের আর একটি নাম – মুজিবর
সাড়ে সাত কোটি প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম
জয় বাংলা, জয় মুজিবর, জয় বাংলা, জয় মুজিবর।

৩. বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক অনুষ্ঠানমালা

২৫ শে মার্চের কালো রাত থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বর্হিবিশ্বের সচেতন মানুষের মধ্যে এই অমানবিক পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঝড় উঠতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রথম দিকের প্রতিবাদ সম্পর্কিত একটি তথ্যে জানা যায়– '৩রা এপ্রিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি সাহায্য সংস্থা..., এ ছাড়া বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি (পুনা), বাংলাদেশ এইড কমিটি (বোম্বে), ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর বাংলাদেশ,... বোম্বে ইউনিভার্সিটি কমিটি, বাংলাদেশ সংগ্রাম সহায়ক সমিতি (লেক গার্ডেন কলকাতা), বিভিন্নভাবে কাজ করেছে (ভৌমিক, ২০০৭ : ১৮)। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশকে নানাভাবে সহায়তা করার জন্য নতুন নতুন কমিটি ও সংগঠন তৈরি হতে থাকে। যেমন – শিকাগোতে Friends of the movement; লন্ডনে Friends of the Dhaka University, Bangladesh Students Action Council , Bangladesh Green cross; শ্রীলংকায় Out to the people. আমাদের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা কবি, শিল্পী, গায়ক, বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতিসেবী। বাংলাদেশের মানুষের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ উদ্বেল ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিশ্বের খ্যাতনামা মানুষদের। তাঁরা সেই দিনগুলোতে ইউরোপ-আমেরিকার রাস্তায় মিছিল করেছেন। সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করেছেন, আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছেন। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার, লন্ডনের অ্যালবার্ট হল, বার্লিনের আলেকজান্ডার প্লাৎসা, দিল্লির সংগীত নাটক একাডেমি অথবা কলকাতার রবীন্দ্রসদন মুখরিত হয়েছিল বাংলাদেশের সপক্ষে সংস্কৃতির প্রতিরোধ চেতনায়। এ সব অনুষ্ঠানে যাঁরা সক্রিয় ও উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন পণ্ডিত রবিশংকর, বিটল গ্রুপের অন্যতম জর্জ হ্যারিসন, মার্কিন লোক-প্রতিবাদী গানের অবিসংবাদিত রাজা বব ডিলান, যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের সুপরিচিত কণ্ঠশিল্পী জোয়ান ব্যেজ, বিটলসদের আরেকজন রিঙ্গো স্টার প্রমুখ শিল্পী। প্রতিবেশী ভারতের সত্যজিৎ রায়, লতা মুঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, সুচিত্রা মিত্র, ভূপেন হাজারিকা, সলিল চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মুলকরাজ আনন্দ এবং অন্য সকলেই জয়বাংলার সংগ্রামে সহযোগিতা

করেছেন (রহমান, ২০১২ : ৮২)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আর্জেটিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে একটি মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সেদেশের খ্যাতনামা লেখক এবং রবীন্দ্র-অনুরাগী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে রক্তদানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের দিকপাল আঁদ্রে মালরো। একাত্তরের ২০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্কের সেন্ট জর্জ চার্চে বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষে বর্তমান বিশ্বের প্রধান দুই কবি আমেরিকার এ্যালেন গিন্সবার্গ এবং রুশ দেশের আন্দ্রেই ভজনেসত্রনস্কি কবিতা পাঠ করেছিলেন।

১৯৭১ সালে যুক্তরাজ্যের ওভালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অনুষ্ঠিত হয় একটি চ্যারিটি কনসার্ট। এই ব্যাপক আয়োজনে যুক্তরাজ্যের নামকরা রক-এন-রোল অল্টারনেটিভ, হার্ডরক ও ব্লুজ ব্যান্ড অংশগ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের কেনিংটন শহরের ক্রিকেট মাঠে প্রায় ৪০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে এক কনসার্টে অংশ নেয় The who, The cases, Walls, America shot the Haply, লিন্ডিস ফার্নি, গ্রিনসহ যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানীয় ব্যান্ড। অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় পপ গায়ক রড স্টুয়ার্ট বাঙালি জাতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে বাঘের ডোরা কাটা স্যুট পরে দর্শকের সামনে গান পরিবেশন করেন। সারাবিশ্বেই এভাবে নানা ধরনের সাহায্য সহযোগিতা, প্রতিবাদ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংঘটিত হতে দেখা গেছে।

বহির্বিশ্বের সমর্থনমূলক যে কনসার্টটি বিশ্বনন্দিত হয়েছে তা হলো আমেরিকার ম্যাডিসন স্কোয়ারে The Concert for Bangladesh। ভারতের বিখ্যাত সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশংকর ১লা আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে বিটলস্-এর পরিবেশনায় এই আয়োজন করেন। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন, এরিক ক্লাপটন, বব ডিলান প্রমুখ গান গেয়ে ও যন্ত্র বাজিয়ে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য ও সমর্থন আদায় করেন। কনসার্ট ফর বাংলাদেশের উদ্বোধনে পণ্ডিত রবিশংকর সেতার এবং ওস্তাদ আলী আকবর খান সরোদে বাংলা ধুন পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০ হাজার দর্শক- শ্রোতা সমবেত হয়েছিল এবং এই কনসার্ট থেকে আয় হয়েছিল ২,৪৩,৪১,৮৫০ ডলার। ইউনিসেফের বাংলাদেশের শিশু সাহায্য তহবিলে তা দান করে দেয়া হয় (রহমান, ২০১২ : ৮৪)। ৪০ টি মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠানের গান ও কথা রেকর্ড করে ৩টি লং প্লে নিয়ে একটি এ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছিল। সাথে ছিল বহু রং-এ মুদ্রিত অনুষ্ঠানের সচিত্র বর্ণনা সম্বলিত সুন্দর পুস্তিকা। এই কনসার্টে জর্জ হ্যারিসন 'বাংলাদেশ' নামক অসাধারণ একটি গান রচনা করেন এবং মঞ্চে গেয়ে শোনান। গানটি হলো–

My friend came to me, with sadness in his eyes
He told me that he wanted help
Before his country dies

৪. শরণার্থী শিবিরে উদ্বুদ্ধকরণের গান

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সেই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের রাত থেকেই মূলত বাংলাদেশ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। একদিকে স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বন্দি, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের বন্দি ও নির্মম হত্যা শুরু হলে সারাবাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ উপায়ান্তর না দেখে ঘর-বাড়ি, সংসার-পরিজন, গোলা-মাঠ-ফসল সবকিছু ফেলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সীমান্তের দিকে পালাতে থাকে। ভারত সরকার সীমানা উন্মুক্ত করে দেয়। পাঁচটি সীমান্ত দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতে প্রবেশ করে। এই পাঁচটি প্রবেশস্থল হলো পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয়, আসাম এবং বিহার। ভারত সরকারের তথ্যমতে ২৫ শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট শরণার্থী প্রবেশ করে ৯৮,৯৯,৩০৫ জন (Bangladesh Documents, 1972 : 672)।

শরণার্থী শিবিরে একের পর এক অনাহার-অর্ধাহার, রোগ-শোক-জীর্ণতা-মৃত্যুর কঠিন ও মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটতে থাকে। সেখানে অসহায় মানুষকে আপাত সান্ত্বনা দেয়ার জন্য নানান ধরনের স্কোয়াড গঠিত হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার নির্দেশ দেন। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী সংস্থা, শরণার্থী শিল্পীগোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু শিল্পীগোষ্ঠী, বাংলাদেশ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা নামে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্কোয়াড অনুষ্ঠান করে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা, অর্থ, ওষুধপত্র, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে দান করা এবং স্কোয়াডের সকলের জন্য একটা মাসিক বন্দোবস্ত করা– প্রভৃতি কাজে এ স্কোয়াড নিরলসভাবে কাজ করেছে। বিক্ষুব্ধ বাংলা, রূপান্তরের গান, এক পথিকের আত্মকথা প্রভৃতি গীতিআলেখ্য এবং দেশাত্মবোধক গান, গণসংগীত এসব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছিল। শিল্পী, কলা-কুশলী, নাট্যকার, গীতিকার সকলের মনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে একটাই আকাঙ্ক্ষা একটাই প্রার্থনা; বাংলাদেশের স্বাধীনতা–মুক্তি, সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মুক্তি। বাংলাভাষার মুক্তি।

আমেরিকান কবি এ্যালেন গিন্সবার্গের September on Jessore Road' কবিতার মধ্যে শরণার্থীদের নির্মম জীবনের বর্ণনা লুকিয়ে আছে–

Millions of babies watching the skies
Bellies swollen, with big round eyes
On Jessore Road-Long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts

শরণার্থী শিবিরে দেশাত্মবোধক, স্বদেশী, পঞ্চগীতিকবির গান ও বাংলা লোকসংগীত নিয়মিত গাওয়া হতো।

৫. মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গান

৭১-এর পূর্বেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বাঙালি জাতিকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সে সংগ্রামকে গতি দিয়েছিল বিভিন্ন দেশাত্মাবোধক গান। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিকামী বীরযোদ্ধারা সেসব গান থেকে যেমন অনুপ্রেরণার রসদ পেয়েছে ঠিক তেমনি তাদের উজ্জীবিত করায় প্রয়োজনে নব-পর্যায়ে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবী-কবি-গীতিকাররা রচনা করেছেন উদ্দীপনামূলক গান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির, গেরিলা ও মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত গানও মুক্তিযুদ্ধের সময় ভূমিকা রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুকুন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখের গীত-গান সমগ্র বাঙালি-চিত্তে সঞ্চার করেছিল প্রাণের জোয়ার।

উনিশ ও বিশ শতকের সূচনাকালে কিংবা ভারত-বিভক্তির পরবর্তীকালে দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনাভিত্তিক যেসব গান রচিত হয়েছে সেসব গানও প্রচারিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালে। এ সকল গান পাকিস্তানি শাসনামলে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম অধিকার আদায়ে এবং রেডিওতে প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। সে সকল গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ দেয়া হলো । যেমন খান আতাউর রহমানের কথা ও সুরে–

হায়রে আমার মন মাতানো দেশ
হায়রে আমার সোনা ফলা মাটি।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের রচনা ও আব্দুল আহাদের সুরে –

আমার দেশের মাটির গন্ধে
ভরে আছে সারা মন
শ্যামল কোমল পরশ ছাড়া যে
নেই কিছু প্রয়োজন।

আবদুল লতিফের লেখা ও সুরারোপিত–

সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা
সোনা নয় যত খাঁটি
বলো যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি।

বাংলার চিরায়ত রূপ-ঐশ্বর্যে মুক্তিযোদ্ধারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বাংলার সেই চিরন্তন রূপের আকর্ষণে বার বার ফিরে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে কলকাতার গীতিকার শ্যামল

গুপ্তের কথা ও অপরেশ লাহিড়ীর সুরে। গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন শব্দসৈনিক মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আবদুল জব্বার।

হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে
বাংলার বুকে আছি দাঁড়িয়ে
শুনেছি তোমার ডাকে জীবন ডাকছে যেন
মরণের সীমানাটা ছাড়িয়ে।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদী স্বরকে সরব করে তোলার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেমের প্রেরণা যোগাতে হৃদয়মথিত করা অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমের গান রচনা করেছেন গীতিকার নঈম গওহর এবং সুর দিয়েছেন আজাদ রহমান–

জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাক।

স্বাধীনতাসংগ্রাম কালে অসংখ্য দেশগান রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গান–

আলী মোহসীন রেজার লেখা এবং রথীন্দ্রনাথ রায় সুরারোপিত—

চাষাদের মুটেদের মজুরের
গরীবের নিঃস্বের ফকিরের
ছোটদের বড়দের সকলের
আমার দেশ সব মানুষের।

শহীদুল ইসলামের লেখা–

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার, বাংলা আমি।

কলকাতার গীতিকার গোবিন্দ হালদারের লেখা–

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা তোমার আমার ঠিকানা
এক বাংলার কোটি প্রাণে আজ
একই পথের নিশানা।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কালে যে সকল গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবদুল লতিফ, আলতাফ মাহমুদ, শেখ লুতফর রহমান, সমর দাস, অজিত রায়, সুজেয় শ্যাম, শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে দেশাত্মবোধক এসব গানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি এখনো বিষবাষ্প

ছড়িয়ে বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে বার বার ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। সে সকল কূটচালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য এই গানসমূহ আজো ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে।

৬. স্বাধীনতা-উত্তর বিজয়ের গৌরববন্দনামূলক গান

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের পর অবশেষে এলো বহুপ্রতীক্ষিত বিজয়দিবস– ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু এ বিজয় যতটুকু না আনন্দের তার চেয়েও বেশি করুণ-বিষাদের। হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগে সারা বাংলা যেন প্রকৃতই শ্মশানভূমি। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই শহীদ হয়েছেন। কেউ চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন, কেউ হারিয়েছেন মা-বাবা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, কিংবা আত্মীয়স্বজন। এসব সর্বগ্রাসী রিক্ততার মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে নেমে এলো ঘোর অমানিশা; ইতিহাসের উল্টোরথে যাত্রার সেসব দৃশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের করে তুললো নির্বাক। তবু মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময় পরিসরে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বব্যঞ্জক অবদান এবং দেশপ্রেমের উল্লেখে রচিত হয়েছে অনেক গীত-গান। খান আতাউর রহমান তাঁর গানে অতি মর্মস্পর্শী বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

হয়তো বা ইতিহাসে
তোমাদের নাম লেখা রবে না
বড় বড় লোকেদের ভিড়ে
জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না
তবু এই বিজয়ী বীর মুক্তিসেনা
তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন
শোধ হবে না ॥

বাংলার আকাশে যারা স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিল তাদের যেন বাঙালি জাতি কোনোদিন ভুলতে না পারে, সেই বর্ণনার অম্লান বাণী এই গানে বিধৃত হয়েছে। একই গীতিকার আরো একটি গানে সেই শহীদদের ভুলে না যাবার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। তাদের অসীম সাহসিকতার জন্যই বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই কৃতজ্ঞতাবোধ বাঙালি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। সেকথা লিখিত হয়েছে নিম্নোক্ত গানে–

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা
আমরা তোমাদের ভুলবো না ॥

মুক্তিযুদ্ধের গৌরব হিসেবে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড মিলেছে ঠিকই কিন্তু এর জন্য যে প্রাণ দিতে হয়েছে তা অবর্ণনীয়। ফলে শহীদ ও হারিয়ে যাওয়া সৈনিকের শোকগাথা বেশি উঠে এসেছে এ সময়ের গানে। বাংলা-গানের বাগানকে ঢেকে দিয়েছে বীরত্বময় শোকের চাদর। নজরুল ইসলাম বাবু রচনা করেছেন –

সবকটা জানালা খুলে দাও না
আমি গাইব বিজয়েরই গান
ওরা আসবে চুপি চুপি
যারা এই দেশটাকে ভালোবেশে
দিয়ে গেছে প্রাণ ॥

নাসিমা খান মুক্তিসেনাদের উদ্দেশে লিখেছেন–

যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে
লক্ষ মুক্তিসেনা
তোরা দে না, দে না
সে মাটি আমার অঙ্গে মাখিয়ে দে না ॥

মোস্তাফিজুর রহমানের কথা ও সমর দাসের সুরে–

ভেব না গো মা তোমার ছেলেরা
হারিয়ে গিয়েছে পথে।
ওরা আছে মাগো হাজার মনের বিপ্লবী চেতনাতে।

স্বাধীনতা এত সহজে অর্জিত হয়নি। এটি বাঙালি জাতির অত্যন্ত গর্বের। এই মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ করে হয়নি। এর পিছনে শত শত বছরের প্রস্তুতি ছিল। পলাশির যুদ্ধে সিরাজদৌলার পতনের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার যে শৃঙ্খলে জাতি আবদ্ধ হয়েছিল তা থেকে মুক্তি পেতে কী কী সংগ্রাম ও বিপ্লবের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সে কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে আবদুল লতিফের একটি জনপ্রিয় গানে–

দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
কারো দানে পাওয়া নয়
দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি
আছে জানা জগৎময় ॥...

একাত্তরের নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাস। পাকবাহিনী পরাজিত হলো মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসের কাছে। যুদ্ধে প্রাণ দিলো লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান। এলো মুক্তি, এলো স্বাধীনতা। সেই বহু প্রতীক্ষিত বিজয়ের গান আখতার হুসেনের কথা এবং অজিত রায়ের সুরে–

স্বাধীন স্বাধীন দিকে দিকে
আজ জাগবে বাঙালিরা
আজ রুখবে তাদের কারা ॥

মুক্তিযুদ্ধের অবসান। সবার মনে আনন্দের বন্যা। বিজয়ের নিশান উড়ছে। স্বাধীনতার সূর্য নিশানের মাঝখানে আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিজয়ের শেষ গান প্রচারিত হলো, শহীদুল ইসলামের কথা ও অজিত রায়ের সুরে –

বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
খুশির হাওয়ায় ঐ উড়ছে
বাংলার ঘরে ঘরে
মুক্তির আলো ঐ ঝরছে ॥

এভাবে বাঙালি শব্দসৈনিকগণ গান রচনা করে বাঙালিকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির ও দেশের ভেতরে-বাইরে সৃজনশীল কবি-গীতিকারগণ মুক্তির প্রণোদনায় রচনা করেছেন অসংখ্য-অজস্র গান। এসব গানের ভাষা, বোধ ও বক্তব্যে উঠে এসেছে যুদ্ধের বাস্তবতা, সময় ও সংকটের ইতিহাস। এ গানগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ উঠে এসেছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। এই গানসমূহ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির, গ্রামগঞ্জের লোকআসর, পালা-পার্বণ, মুক্তিযোদ্ধা-ক্যাম্প সর্বত্র গীত হয়েছে। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত ও গীত হয়েছে এসব গান। মুক্তিযোদ্ধাদের জেগে ওঠার জন্য এই গানগুলো ছিল পরশমানিকের মতো।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ শরীফ (১৯৮৫)। *কালের দর্পণে স্বদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা

শামসুল হুদা চৌধুরী (২০১০)। *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, সম্পাদনা, ড. জাহিদ হোসেন প্রধান, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

শামসুল হুদা চৌধুরী (২০১০)। *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্রের ইতিহাস*, সম্পাদনা, ড. জাহিদ হোসেন প্রধান, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

দুলাল ভৌমিক (প্রবন্ধ) (২০০৭)। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান, *ভারত বিচিত্রা*, নান্টু রায় সম্পাদিত, ডিসেম্বর

মতিউর রহমান (২০১২)। *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী

মতিউর রহমান (২০১২)। *মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গান*, অনুপম প্রকাশনী

Bangladesh Documents (1972). Vol. 2. New Delhi : Ministry of External Affairs, India